ছাত্রছাত্রীদের অবসাদ নিয়ে দুচার কথা

কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে অবসাদ ক্রমবর্ধমান।

চার থেকে আঠারো বছর বয়সিদের মধ্যে শতকরা দুই থেকে আট ভাগ অবসাদের শিকার।

শিশুদের থেকে বয়ঃসন্ধিকালীন কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে অবসাদ হবার সম্ভাবনা বেশি।

মনখারাপ , বিরক্তি, পছন্দের জিনিসে অনাগ্রহ , ঘুম ও খিদের সমস্যা , ভবিষ্যত নিয়ে নৈরাশ্য , নেগেটিভ চিন্তাভাবনা , এইসব হল অবসাদের লক্ষণ।

অন্য অনেক কারণের মধ্যে পারিবারিক সমস্যা , সম্পর্কের টানাপোড়েন , শৈশবের কোনো খারাপ অভিজ্ঞতা অবসাদের পিছনের কারণ হতে পারে।

অবসাদ আত্মহত্যার একটি প্রধান কারণ।

অবসাদগ্রস্ত কিশোর-কিশোরীদের অনেকের মধ্যেই আত্মহত্যার চিন্তা আসে। তাদের মধ্যে অনেকেই আত্মহত্যার চেষ্টাও করে থাকে।

সঠিক সময়ে লক্ষণ দেখে অবসাদ নির্ণয় ও দ্রুত চিকিৎসা কিশোর বা কিশোরীটিকে স্বাভাবিক জীবনে ফেরাতে পারে।

বয়ঃসন্ধির চাপ

1. কিশোর-কিশোরীরা প্রকৃতিগতভাবে তাদের দৈনন্দিন জীবনে চাপ অনুভব করে।

2. পারিবারিক দ্বন্দ্ব, পড়াশোনার চাপ, পরীক্ষার ফলাফল এবং বাবা মায়ের প্রত্যাশা পূরণ কিশোর কিশোরীদের মানসিক চাপ বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ।

3. ভবিষ্যতে কোথায় পড়তে যাবে, কী করবে এ সব নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভোগে এই বয়সি ছেলেমেয়েরা।

4. নাগরিক জীবনে অণু পরিবার কাঠামোর কারণে একাকিত্ব, স্কুলে বা অবসর সময়ে সমবয়সিদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, বুলিং - এসব কারণেও মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়।

5. রোম্যান্টিক সম্পর্কের টানাপোড়েন , শারীরিক সম্পর্ক , নিজের শারীরিক অবয়ব , সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি নিয়েও অনেকে চাপ অনুভব করে।

6. এসময় ছেলেমেয়েরা বাবা মায়ের সাথে সমস্যা নিয়ে কথা বলতে চায় না , বরং বন্ধুদের ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়।

7. মানসিক চাপের কারণে অল্পবয়সি ছেলেমেয়েদের জীবনে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়ে।

8. বহু ক্ষেত্রে মানসিক চাপ মোকাবিলার নামে নেশার সামগ্রী , বিপজ্জনক আচরণ এমনকি আত্মহত্যার পথে এগিয়ে যায়।

9. এদের সমস্যাগুলিকে সমানুভূতি নিয়ে বোঝা, ব্যঙ্গ বিদ্রুপ না করে সোজাসুজি কথা বলা , বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক আচরণকে চেনা জরুরি।

10. বড়দের আচরণে সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধের প্রতিফলন , নাগরিক ও পারিবারিক জীবনে গণতান্ত্রিক ও দায়িত্বশীল আচরণের পরিসর বজায় রাখা এবং সর্বোপরি সংকট মুহূর্তে তাদের সমর্থন জোগান ও পাশে থাকা জরুরি।

কী করব আর কী করব না

1. ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ ও মনোভাবের দিকে নজর রাখুন।

2. সংবেদন ও সহানুভূতিশীল কথা বলার পরিবেশ তৈরি রাখুন। ধৈর্য্য ধরে শুধু শুনে যাওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

3. খুব ব্যক্তিগত কিছু আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করা বা অন্যদের সাথে আলোচনা একদমই নয়।

4. ঠিক-ভুল বিচার বা নীতিগত উপদেশ একদমই নয়।

5. নজরে রাখুন ও অন্যদের সতর্ক করুন।

6. প্রয়োজনীয় ভরসা জোগান। কিন্তু বিপদ বুঝে প্রাথমিক অবস্থাতেই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

হাত বাড়ালেই বন্ধু, কথা শোনার বন্ধু হয়ে উঠুন।

আত্মহত্যা: একটি জনস্বাস্থ্য সমস্যা

আত্মহত্যার পরিসংখ্যান থেকে আমাদের মত দেশে পরিস্থিতির সম্পূর্ণ মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। যৎসামান্য ইঙ্গিত পাওয়া যায় অবশ্য।

সারা বিশ্বে নজর রাখলে দেখা যাবে, প্রতি বিশ সেকেন্ড সময়ে কোনও না কোনও মানুষ আত্মহত্যার চেষ্টা করছেন। আমাদের দেশে এই সংখ্যাটা যথেষ্টই, প্রতি চারটি আত্মহত্যার ঘটনায় অন্তত একটি এদেশে ঘটছে।

যাদের মধ্যে কম বয়সের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রটি সবিশেষ। পনেরো থেকে উনত্রিশ, পরিসংখ্যান এদেশে এ বয়েসটাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে।

বেড়ে ওঠা বয়সের অনেক দাবি থাকে, চাপও ঢের। সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা থেকে লেখাপড়া, কেরিয়ার তৈরি , এমন অনেক কিছুই এই বয়সের টাস্ক।

দুনিয়া জুড়ে আর্থসামাজিক, প্রযুক্তিগত ও গণমাধ্যমের এত পরিবর্তনের মধ্যে আমাদের ছেলেমেয়েগুলো ঠিক কেমন আছে তা কি সদা সর্বত্র আন্দাজ করতে পারি আমরা ?

ছেলেমেয়েরাও কি ক্রাইসিস সিচুয়েশনে অভিভাবকের কাছে স্বচ্ছন্দে সব কষ্টের কথা বলতে পারে ? মনের স্বাস্থ্য বিষয়ে সমাজে লালিত এবং প্রচলিত ধারণাগুলো তাদের মন খুলে কথা বলতে দেয় কি ?

সম্পর্কের বিপর্যয়, পরীক্ষার ফলাফল, প্রতিযোগিতার হাড্ডাহাড্ডি দৌড়, পারিবারিক সমস্যা, আর্থিক সমস্যা, নিকট জনের মৃত্যু কিম্বা অসুস্থতা, এসবের সঙ্গেই এখন জুড়ে গেছে বিবিধ নেশা আর বিহেভিয়ারাল অ্যাডিকসন। হাতে হাতে মোবাইলের সংযোগের এই বিস্ফোরণেও কী নিদারুণ সংযোগহীন আমরা !

প্রতিটি পদক্ষেপে উদ্বেগ, হতাশার মেঘ আত্মমূল্যের পারদ নামাতে থাকে। সব পেয়েছির আসরের স্বপ্ন দেখা আমাদের ছেলেমেয়েরা তখন ধীরে ধীরে নিঃসঙ্গ, একলা।

এই ভারতবর্ষেই সেই ফাঁকে কিন্তু ঘটে চলেছে বিপজ্জনক একটি আখ্যান, প্রতি কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে এখানে একটি করে ছাত্র বা ছাত্রীর আত্মহত্যাজনিত মৃত্যু হয়।

কে দায়ী ? সমাজ, না সিস্টেম ?

স্টুডেন্টস হেলথ হোমের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক ডাঃ পবিত্র গোস্বামী কর্তৃক জনস্বার্থে প্রকাশিত এবং পান প্রিন্টার্স কলকাতা- ৬ থেকে মুদ্রিত।

Gatekeeper Training

১৪ জুন, ২০২৪

মৌলালি যুব কেন্দ্র, কলকাতা

স্টুডেন্টস হেলথ হোম

১৪২/২ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা ১৪
যোগাযোগ: ৯০৭৩৮৪২৮৬৬
Email: healthhome1952@gmail.com
Website: www. studentshealthhome.com

হাত বাড়ালেই বন্ধু

আর্থসামাজিক বিরূপ পরিস্থিতি ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষকে ক্রমশ সংকটময় একাকিত্বের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই ক্রমবর্ধমান চরম হতাশা ছাত্রছাত্রীদের আত্মহননের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তথ্য অনুযায়ী ভারতবর্ষে প্রতি 40 মিনিটে একজন শিক্ষার্থী আত্মহননের পথে হারিয়ে যাচ্ছে। সমাজে এখন প্রয়োজন সচেতন ও সংবেদনশীল প্রহরা। আত্মহত্যা প্রবণতা প্রাথমিক অবস্থাতেই প্রতিরোধের জন্য **GATEKEEPER** প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে অগ্রণী ভূমিকা পালন করুন। বিপদের চিহ্ন বুঝে কীভাবে পাশে থাকবেন সেটা জানাই এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য। সচেতন শিক্ষক, অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীরা প্রশিক্ষিত হয়ে সংকটাপন্নদের পাশে থাকুন। আসুন, আমরা হয়ে উঠি **হাত বাড়ালেই বন্ধু**।

আত্মহত্যা: কিছু মিথ, কয়েকটি সত্যি কথা

মিথ: শক্ত পোক্ত মনের লোকে সুইসাইড করে না।

বাস্তব: আত্মহত্যা কোনো দুর্বল মনোভাবের ফল নয়, এটা একটা বিপদ সংকেত, কষ্টের চিহ্ন, যার অন্তরালে নানাবিধ কারণ থাকে।

মিথ: যারা মুখে সুইসাইড করার কথা বলে, তারা কখনও সুইসাইড করে না।

বাস্তব: এই ধারণা ভুল। বেশিরভাগ সময়ই কথাবার্তায় আচরণে আগাম সংকেত থাকে। অজ্ঞতাবশত আমরা সেই কমিউনিকেশনটা ধরতে পারিনা।

মিথ: কাউকে আত্মহত্যার কথা জিজ্ঞাসা করাটা ঠিক নয়, এতে এই প্রবণতা বেড়ে যেতেই পারে।

বাস্তব: সুইসাইডের প্রসঙ্গে জিগ্যেস করা মানে কাউকে তাতে উদ্বুদ্ধ করা নয়, বরং মন খুলে কথা বলার সুযোগ পেলে হয়তো এ সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়াটা সহজ হয়।

মিথ: কেউ আত্মহত্যা করবে মনে করলে সে অবশ্যই তা করবে।

বাস্তব: মারাত্মক ভুল এটা! আত্মহত্যার ইচ্ছে, চিন্তা, ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ কোনো চেষ্টার পরও কথাবার্তা বলে, কাউন্সেলিং, থেরাপি এবং প্রয়োজনে ওষুধের প্রয়োগে, একজন মানুষকে আবার স্বাভাবিক জীবনের পথে ফেরানো সম্ভব। তাই আগে থেকেই হাল ছাড়া আদৌ ঠিক নয়। কমবয়েসিদের বেলায় তো একেবারেই নয়।

মিথ: সুস্থ লোকে সুইসাইড করে না, চেষ্টা মানেই মাথার গন্ডগোল আছে।

বাস্তব: আত্মহত্যার চেষ্টা মানেই মনোরোগ আছে, এই ধারণা ঠিক নয়। মনোরোগ ছাড়াও আরও বহু কারণে মানুষ এমন সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে যায়।

মিথ: সুইসাইড আসলে বংশগত অসুখ।

বাস্তব: যে সমস্ত পরিবারে আগে আত্মহত্যার মতো ঘটনা ঘটেছে, মানসিক রোগও কারও না কারও হয়েছে, এমন ইতিহাসও রয়েছে, অবশ্যই তাদের কারুর কারুর মানসিক রোগে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি বেশি। যা থেকে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটতেই পারে। তবে তার মানে এটা কিছুতেই না, যে আত্মহত্যা বংশগত।

মিথ: মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ বা মনোবিদ ছাড়া আর কোনও সাধারণ মানুষের পক্ষেই আত্মহত্যা থামানো অসম্ভব।

বাস্তব: যে কোনো সংবেদনশীল মানুষ এ কাজটা করতে সক্ষম। তাঁকে বিপজ্জনক চিহ্নগুলো বুঝে নিয়ে কাজটা করার সাহস এবং উপস্থিত বুদ্ধি ধরে রাখতে হবে কেবল। এতসব আলোচনার মধ্যেই এটা তো স্পষ্ট যে **আত্মহত্যা অবশ্যই একটা প্রতিরোধযোগ্য বিষয়**।

কমবয়েসিদের ক্ষেত্রে যেসব কারণে সুইসাইড হতে পারে অর্থাৎ সেই আশঙ্কার পরিস্থিতিগুলি হল -

- নিতান্ত আপন কোনো মানুষের মৃত্যু অথবা জীবন থেকে সরে যাওয়া।
- অতিরিক্ত মানসিক চাপ।
- নিজের পারঙ্গমতা বিষয়ে আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি, নিজের দ্বারা কিছুই হওয়ার নয়, এইরকম বোধ।
- নিজেকে সফল হতেই হবে, এই চাপ।
- নিজের অকৃতকার্যতায় বিরক্তি, অসন্তোষ।

বেশ কিছু বিপজ্জনক লক্ষণ বা চিহ্ন আমরাও প্রত্যেকেই সামান্য খেয়াল করলেই বুঝব -

আচরণ

- একটা ছটফটে অস্থির ভাব।
- হঠাৎই কান্না, তেমন বড় কোনো কারণ ছাড়াই অনেক বেশি রেগে যাওয়া।
- ঘুম কমে যাওয়া অথবা হয়ত সারাদিনই ঘুমোচ্ছে।
- বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তার আগ্রহ, মেলামেশা কমে যাচ্ছে - সবকিছু থেকেই নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার একটা প্রবণতা যেন।
- কোনও কিছুতেই আগ্রহ নেই, ভাল খাবার, পোশাক, পছন্দের জিনিস, কিছুই ভাল লাগেনা। অন্য কাউকে নিজের অত্যন্ত ফেভারিট কিছু দিয়ে দেওয়াও দেখা যায়।
- কাজকর্মের ধরণধারনে অতিরিক্ত ছটফটানি, জোরে বাইক চালিয়ে দিচ্ছে, নেশা করছে, অকারণ ঝগড়াঝাঁটিতে জড়িয়ে পড়ছে।
- অতিরিক্ত নেট সার্চিং, বিশেষত আত্মহত্যা অথবা মৃত্যু বিষয়ক সাইটে খোঁজখবর।

অনুভূতি

- একটা ফাঁকা অনুভব, যেন কিছুই আর করার নেই, একটা ভ্যাকুয়াম। অতিরিক্ত উদ্বিগ্ন ভাব, ফেঁসে গেছি, আটকে গেছি, এই রকম ফিলিংস!
- অপরাধবোধ, অন্যায়ের বোধ, আর কিছু হবে না, এরকম ভাব।

কথাবার্তা

- আর ভাল লাগছে না, বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না, একদিন ভ্যানিস হয়ে যাবার কথা।
- ভীষণ চাপে আছে, এইরকম কথা।
- " যেদিন থাকব না সেদিন বুঝবে ", " আর বেশিদিন কষ্ট দেব না " - এমন সব কথাবার্তা।

এই সব আচরণ, অনুভব অথবা কথাবার্তার বিন্দুমাত্র আঁচ পেলেও ভাবতে হবে। বিশেষত যদি অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করা যায়।

কাছের মানুষরা চাইলেই কিন্তু একটা আন্দাজ পাবেন, হলই বা সেটা ফলস্ অ্যালার্ম, তাতেই বা কি?

আমাদের সকলেরই কাজটা হল, ছেলেমেয়েদের এই অসহায়তা, কষ্টটুকু বোঝা।

কথা বলার মতন সংযোগ সেতুটা তৈরি করতে হবে, তবেই পাশে থাকার বার্তা সার্থক হতে পারে। সমালোচনা, জাজমেন্ট, তিরস্কার করার অনেক সময় পড়েই আছে, এখন ওসব সরিয়ে ওদের কষ্টের অনুভবটুকু আপনিও যে বুঝছেন সেটুকুই থাক না!

তারপর প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ, কাউন্সেলিং সব হবে।

এই কষ্টের দিনে, অসহায় মুহূর্তে

স্টুডেন্টস হেলথ হোম

আপনার পাশেই আছে।